বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড, মৃত্যুদন্ডের বিধান এবং কিছু কথা

ম. মাহমুদ

আইএফডি স্পেশাল আর্টিকেল সিরিজ
আর্টিকেল ১

জানুয়ারী ২২, ২০১০

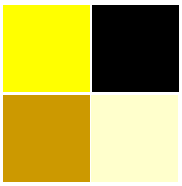

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড, মৃত্যুদন্ডের বিধান এবং কিছু কথা

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। দীর্ঘ দিনের আইনি প্রক্রিয়ার পর আসামীদের ফাঁসির আদেশ বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারকেরা তাদের রায় প্রদান করেছেন। অতি সম্প্রতি তিনজন ফাঁসির আসামীর ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন ফিরিয়ে দিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান। তাই আসামীদের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা এখন সময়ের ব্যাপার মাএ।

এমনই এক অবস্থায় এই বিষয়টি নিয়ে যে আইএফডি'র প্রথম স্পেশাল আর্টিকেল আমাকে তৈরি করতে হবে, তা আমি কোনদিনই ভাবিনি। তবে বিগত কিছুদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড কোন প্রেক্ষাপটে হয়েছিল, কেন সেই সময় জাতি এমন একটি নৃশংস হত্যাকান্ডের কোন প্রতিবাদ করেনি, এবং সর্বোপরী মৃত্যুদন্ডের বিধান সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে কি মনে করি, সেই বিষয়ে নিজস্ব বিশ্বাসগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। এতে আর কিছু না হোক, মৃত্যুদন্ডের বিধান নিয়ে জনমনে অন্য ধরণের এক ধারণার বিকাশ ঘটলেও ঘটতে পারে।

আমরা সকলেই এখন তাকিয়ে আছি কবে এই ফাঁসির আসামীদের রায় কার্যকর হবে। আর মাত্র কিছুদিন। এরপরই তাদের সবাইকে ফিলিপিনো রশি দিয়ে ঝোলানো হবে। আর আমরাও সবাই মিলে হাততালি দেব।

কিন্তু কেউ কি কখনো মনে করছেন এই মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা কিভাবে অন্ধকার সেলে তাদের দিনগুলি এখন অতিক্রম করছে। আপনারা কিছু মনে না কুরন, কিন্তু আমি যখনই এই রকম একটি মুহূর্তের কথা কল্পনায় আনছি, তখনই আমার রক্ত শীতল হয়ে যাচ্ছে।

কেমন হতে পারে এই সকল মুহূর্ত যখন আপনি জানেন, আর কিছুদিন পরই আপনার জীবন প্রদীপ নিভে যাবে? আপনি যখন জানেন, আর কিছুদিন পরই আপনি আর এই সুন্দর পৃথিবীতে আর থাকবেন না?

এই বীভৎস মুহূর্তগুলো কেমন হতে পারে, তা আমার জানা নেই।

তবে অন্তত এইটুকু বুঝতে পারছি, কিছু ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর আমরা সবাই মিলে সেই শুভক্ষণের দিকে তাকিয়ে আছি, এই পুরো ব্যাপারটাই আসলে অমানবিক।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দীর্ঘদিন থেকেই মৃত্যুদন্ডের বিধানকে রহিত করার জন্য বিভিন্ন সরকারের কাছে তাদের আবেদন জানাচ্ছে। এই মামলার ক্ষেত্রেও তারা একই আবেদন করেছে। আমার আজ মনে হচ্ছে, তাদের এই আবেদনকে সমর্থন করে বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে আমার কিছু লেখা উচিত।

তবে আমার অবস্থান কেন মৃত্যুদন্ডের বিধানের বিরুদ্ধে, তা জানানোর আগে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড এবং তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু মতামত সবার কাছে তুলে ধরছি।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড

আমি বড় হয়েছি একটি ডানপন্থী এবং ধার্মিক পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই আমাকে বলা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়াতে দেশের অনেক লাভ হয়েছে। কারণ তার শাসনামলে আইন শৃঙ্খলার যেমন অবনতি হয়েছিল, তেমনি দ্রব্যমূল্যও আকাশ ছুঁয়েছিল। ১৯৭৪ সালে তার আমলেই বাংলাদেশের প্রথম দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তাই কর্ণেল ফারুক-রশিদরা মিলে যখন তাকে এবং তার পরিবারকে শেষ করে দিল, তখন জনগণ উল্লাশ প্রকাশ করেছিল। তারা মিষ্টি বিতরণ করেছিল। সারা দেশে তখন আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল।

আমাকে বলা হয়েছিল, তিনি নিহত হওয়াতেই বাংলাদেশের একটি মুল সমস্যা মিটে যায়। কারণ তিনি ছিলেন একজন অযোগ্য প্রশাসক। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় আসীন হন, তখন দেশে স্থিতাবস্থা ফিরে আসে। তখন দেশ উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয়। তাই তিনি হয়ে ওঠেন জনপ্রিয় একজন নেতা। তাই তিনিও যখন একই বাহিনীর অফিসারদের হাতে নিহত হন, তখন তার জানাজায় লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি মানুষের ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছিল এইভাবেই।

দীর্ঘদিন আমি এই বিশ্বাস মনে লালন করেই বড় হয়েছি। আমার কাছে সবসময়ই মনে হয়েছে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বিএনপি'ই বাংলাদেশি চেতনার ধারক এবং বাহক। আর আওয়ামী লীগ ইন্ডিয়াপন্থী। তারা যেমন তাদের শাসনামলে দেশের ক্ষতি করেছিল, ইন্ডিয়ার পক্ষে কাজ করেছিল, তারা তেমনি ইসলাম বিরোধীও। তাই আওয়ামী লীগকে সমর্থন করা এবং ইসলামের বিরোধীতা করা একই কথা।

তবে আমার মানসপটে এই ধরণের ধারণার বিবর্তন আসা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় থেকেই। আমি রাজনীতির সাথে কোন প্রকার সরাসরি সম্পর্ক না রাখলেও আমি প্রতিদিনের সংবাদপত্রটি ঠিকই মন দিয়ে পড়তাম। তাই বিভিন্ন লেখক এবং কলামিস্টদের লেখা আর্টিকেল আমার পড়ার সুযোগ হয়। এইভাবে অসংখ্য লেখকদের বিভিন্নমুখী মতামত পড়তে গিয়েই আমার মনে রাজনীতি সচেতনতা যেমন গড়ে ওঠে, তেমনি বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়েও ধীরে ধীরে নতুন ধারণার বিকাশ ঘটে।

আমার এই ধারণার বিবর্তনের প্রথম প্রতিফলন ঘটে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে। আমি সেবারই প্রথম ভোট দেয়ার সুযোগ পাই। এর আগে ছিল বিএনপি শাসনামল। সেই শাসনামলে বিএনপি মোটামুটি ভালভাবে সরকার চালালেও ছাত্রদলের তৎকালীন চাঁদাবাজি আমার কাছে ভাল লাগেনি। সেই সাথে দীর্ঘ আন্দোলনের পর বিএনপি যখন তত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিল, তখন আমার মনে বেশ বিরক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, বিএনপি যদি এই দাবি মেনেই নিবে, তাহলে এতো পরে মানলো কেন। এতো ঢং করার তো কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে আমার শিক্ষা জীবনও যেমন বিনষ্ট হত না, তেমনি দেশে এতো এতো হরতালও হত না।

তাই বিএনপি'র প্রতি অসীম বিরক্তির কারণে আমি আমার জীবনের প্রথম ভোটটি দেই নৌকাতে।

২০০১ এর সাধারণ নির্বাচনের সময় আমি দেশে ছিলাম না। তখন আমেরিকায় চলে গিয়েছি মাস্টার্স করার জন্য। কিন্তু ততদিনে ইমেইল, ইন্টারনেট চালু হয়ে গেছে। দেশে না থাকলেও দেশের নির্বাচনী উত্তাপ আমাকেও ছুঁয়েছিল। আমি তখন ছিলাম বিএনপি'র পক্ষে। কারণ আমার তখন মনে হয়েছিল, আওয়ামী লীগ যদি আবারো ক্ষমতায় আসে, তাহলে বাংলাদেশের খবর আছে। যে দলের নেত্রী প্রকাশ্যে লাশ ফেলে দেয়ার কথা উচ্চারণ করতে পারেন, সেই দল দেশের জন্য যে কতটা ক্ষতিকর হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য।

তাই ভোট দেয়ার কোন প্রকার সুযোগ না থাকলেও আমার ভোটের পাল্লা পুরোটাই ছিল বিএনপি নের্তৃত্বধীন চার দলীয় জোটের পক্ষে।

এর পরবর্তীতে বিএনপি'র নের্তৃত্বধীন চারদলীয় জোটের শাসনামলের অন্তত দুই বছর দেখার সুযোগ হয়েছে সরাসরি দেশে বসেই। কারণ তখন আমি বিদেশ থেকে ফিরে এসে দ্বিতীয় মেয়াদে সবেমাত্র গবেষণা ক্যারিয়ার শুরু করেছি। আইএফডি এক্সক্লুসিভ পেপার ১ যে গবেষণাটির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, সেই মূল গবেষণাটি আমি করেছি তখনই যখন হাওয়া ভবনের বিভিন্ন কারসাজির খবর লোকের মুখে মুখে।

কিন্তু বিএনপি'র ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ সত্বেও ২০০৬ নির্বাচনকালীন সময়ে আমার অবস্থান ছিল বিএনপি'র পক্ষে। এর কারণ, আমি বিএনপি'র তিনটি সাফল্য নিয়ে বেশ আশান্বিত ছিলাম। এই তিনটি সাফল্য হল, সন্ত্রাস এবং জঙ্গীবাদ দমন, নকল প্রতিরোধ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। এর বিপরীতে আওয়ামী লীগ ছিল অনেকটাই নেতিবাচক মানসিকতার একটি দল। তাই ব্যাপক দুর্নীতি সত্বেও আমার অবস্থান ছিল বিএনপি'র পক্ষে।

যাই হোক, আওয়ামী লীগ ২০০৬ সালের নির্বাচন বর্জন করাতে কোন নির্বাচন আর অনুষ্ঠিত হল না। এই পরিস্থিতিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারী জরুরি সরকার ক্ষমতায় আসে এবং দুই বছর পর একটি নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২০০৮ এর ডিসেম্বরের নির্বাচনেও আমার সরাসরি ভোট দেয়ার কোন সুযোগ হয়নি। কারণ ততদিনে আমি চাকরি নিয়ে চলে এসেছি সৌদিআরবে। তবে বিদেশে থাকলেও নির্বাচনে আমার অবস্থান ছিল আওয়ামী লীগের পক্ষে। কারণ আমার মনে হচ্ছিল এবার আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতা না পায়, তাহলে আবারো একটি সমস্যা হতে পারে।

আমি অতীত বিশ্লেষণ করে দেখেছি, আওয়ামী লীগ কখনোই হারতে চায়না। তারা সব সময় জয়ী হতে চায়। সেই সাথে আমি এটাও খেয়াল করেছি, আওয়ামী লীগ তাদের কিছু আদর্শগত এবং কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে নেতিবাচক রাজনীতি করতে বাধ্য হয়। আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদদের অনেকেই অন্তত আদর্শগত এই দুর্বলতার কথা জানেন, কিন্তু তারা কখনো এটি মুখ ফুটে স্বীকার করেন না। কারণ তারা মনে করেন এই আদর্শগত অবস্থানের কারণেই তারা এখনো টিকে আছেন। তাদের বিশ্বাস তারা যদি এই আদর্শ থেকে সরে আসেন, তাহলে তাদের রাজনীতিই শেষ হয়ে যাবে।

তবে ২০০৮ সালের নির্বাচনে আমার অবস্থান আওয়ামী লীগের পক্ষে থাকলেও আমি মনে মনে চাইছিলাম বিএনপি নির্বাচনে হারুক, কিন্তু সংসদে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে থাকুক। কিন্তু আমি ভাবতেও পারিনি যে বিএনপি এতো কম সংখ্যক সিট পাবে। বিএনপি'র এই বিপর্যয়ে আমি যেমন অবাক হয়েছি, তেমনি কষ্টও পেয়েছি। আমার মনে হয়েছে, নির্বাচনে জেতার জন্য পর্যাপ্ত সদিচ্ছার ঘাটতিই বিএনপি'র এই অধঃপতনের মুল কারণ।

তবে অন্তত এইবার প্রথমবারের মত আমি আওয়ামী লীগের মধ্যে আধুনিকতার সন্নিবেশ দেখতে পেয়েছি। আগে যে আধুনিকতা ছিল বিএনপি'র পুঁজি, সেই আধুনিকতা এখন আওয়ামী লীগের কর্মকান্ডের মধ্যেও দেখা গেছে। এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ তাদের দীর্ঘদিনের দুর্বলতা কিছুটা হলেও কাটাতে পেরেছে বলে আমার বিশ্বাস।

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমাকে এতো কথা বলতে হল পাঠকদেরকে আমার রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেয়ার জন্য। এখন মূল প্রসঙ্গে আসি।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডকে জাতি যে মেনে নিয়েছিল, তা বোধকরি কেউই অস্বীকার করবেন না। এটি যদি কেউ অস্বীকার করেন, তাহলে তা হবে ইতিহাসকে অস্বীকার করা।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এতো বড় একটি জঘন্য হত্যাকান্ড জাতি কিভাবে মেনে নিল? এই হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে কেন কোন জোরালো প্রতিবাদ তখন হয়নি?

শুধু তাই নয়, এই হত্যাকান্ডের মূল হোতাদের যাতে কোন প্রকার বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে না আনা হয়, তার জন্য ইনডেমনিটি এক্ট নামে একটি কালো আইন তৎকালীন খোন্দকার মোশতাক সরকার জারি করেছিল, এবং এই কালো আইন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে পার্লামেন্টে পাশও হয়েছিল।

তাই আবারো মনে প্রশ্ন জাগে, একটি হত্যাকান্ডের বিচার প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ করার জন্য এই কালো আইন কিভাবে একটি সরকার পার্লামেন্টে পাশ করতে পারল? তাদের মনে কি একটিবারও এ নিয়ে প্রশ্ন জাগেনি? আর জাতিও সেসময় এই কালো আইন কেন মেনে নিয়েছিল?

এর একটিই উত্তর।

এর উত্তর হল, সকল মানুষ তখন ভেবেছিল দেশের এই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ড একটি নৈতিক এবং বৈধ কাজ।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেমন খারাপ ছিল, তেমনি আইন শৃঙ্খলার অবনতিও হয়েছিল মারাত্মক হারে। তাই স্বাধীনতার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ভীষণ অজনপ্রিয় হয়ে যান।

মানুষ যখন একটি সমস্যার মূল কারণ জানতে না পারে, তখন মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল এই সমস্যার জন্য একজন ব্যক্তিকে দায়ী করা। এই ধরণের প্রবণতা সাম্প্রতিককালে দুই নেত্রীকে ঘিরেও দেখা গেছে।

বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যখন দুই নেত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তখনো সাধারণ মানুষ এই বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছিল। সবার তখন ধারণা ছিল, এই দুই নেত্রীই আসলে সকল সমস্যার মূল। তাই এই সমস্যাকেই যদি সরিয়ে ফেলা যায়, তাহলেই দেশের সব সমস্যার সমাধান হবে।

১৯৭৫ সালেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। সেই সময় বাংলাদেশ ছিল অনগ্রসর, চরমভাবে দারিদ্র্যপীড়িত, এবং সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর একটি জাতি। অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতি নিয়ে কোন প্রকার সচেতনতাই তখন গড়ে ওঠেনি। তাই স্বাধীনতার পরই বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দামের মূল্য বৃদ্ধির কারণে যে দেশে বাজেট ঘাটতি ঘটছে, মুদ্রার মান নেমে যাচ্ছে এবং বাজার মূল্য বেড়ে যাচ্ছে, সেই তথ্যটি কেউই তখন আমলে নেননি। সেইসাথে স্বাধীনতার পর একাধিক বন্যার কারণে দেশে যে ফসলহানি হয়েছিল, দেশের অর্থনীতিতে তা এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

সেই সাথে অন্যান্য অনেক ফ্যাক্টরও তৎকালীন আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

যেমন পাকিস্তান আমলে যে সকল বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল, তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই। কিন্তু ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর এই দায়িত্বভার অর্পিত হয় অনভিজ্ঞ বাঙালিদের হাতে। এদের অনেকেরই শিল্প প্রতিষ্ঠান চালানোর যেমন কোন প্রকার সরাসরি অভিজ্ঞতা ছিল না, তেমনি অনেকেই তখন নিয়োগ পেয়েছিলেন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায়।

ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অতিরিক্ত ক্ষমতার কারণে সৃষ্ট ভারসাম্যহীনতা জন্ম দেয় ব্যাপক দুর্নীতির এবং এই সর্বব্যাপী দুর্নীতিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি নিজে সৎ থাকলেও তার ক্ষমতার বলয়ের আশে পাশে গড়ে ওঠে এক নব্য বেনিয়া গোষ্ঠী। তার এক বড় দুর্বলতা ছিল, তিনি ছিলেন অতিশয় আবেগপ্রবণ এবং কান কথায় বিশ্বাসী। খুব সম্ভবত এই রকম একটি অসৎ পরামর্শেই তিনি সেনাবাহিনীকে সন্দেহ করা শুরু করেন এবং তার বিকল্প বাহিনী হিসাবে রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলেন। এই পদক্ষেপ তার সাথে সেনাবাহিনীর দুরত্ব বহুগণে বাড়িয়ে দেয়।

দেশের তৎকালীন আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা এই দুরত্বই ১৫ই আগস্টের মূল কারণ বলে আমার বিশ্বাস।

উপরে যে ফ্যাক্টরগুলোর কথা আমি আলোচনা করলাম, তা কোন গভীর গবেষণালব্ধ ফলাফল নয়, ধারণা মাত্র। আমি মনে করি, ১৯৭২-৭৫ সময়কালে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা বিষয়ে একটি ব্যাপক ভিত্তিক সৎ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এই কারণগুলি যদি আমরা জানতে না পারি, তাহলে দেশের দুটি দল এবং তাদের সমর্থকদের মধ্যে যে উঁচু দেয়াল রয়েছে, তা কোনভাবেই ভাঙা সম্ভব হবে না।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড কি নৈতিক এবং বৈধ?

উপরের আলোচনার আলোকে আমাকে এখন যে কোন পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে তৎকালীন জনগণ এবং সরকার যে বিষয়টিকে নৈতিক ভেবেছিল, সেই বিষয়টি এখন আবার ক্ষমতার পট বদলে অনৈতিক হয়ে যাচ্ছে কিভাবে? এই নৈতিকতার মানদন্ড তাহলে কি? হত্যাকান্ড ছাড়া একজন অজনপ্রিয় শাসককে সরানোর তাহলে কি কোন উপায় আছে? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে ক্ষমতার শীর্ষে বসেছিলেন, যেভাবে একদলীয় বাকশাল কায়েম করেছিলেন, সেই পরিস্থিতিতে তো তাকে হত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় খোলা ছিল না।

‘অবয়বহীন দুর্নীতি’ শীর্ষক আইএফডি এক্সক্লুসিভ পেপার ১ আপনারা যদি পুরোটা পড়ে থাকেন. তাহলে নৈতিকতার সর্ব্বোচ্চ মানদন্ড কি, সেই বিষয়ে আপনাদের ধারণা নিশ্চয়ই আছে।

কোন একটি বিষয় নৈতিক, নাকি অনৈতিক, এই বিতর্কে আমরা যদি জড়িয়ে যাই, তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে সর্ব্বোচ্চ ধর্মীয় নৈতিকতার মানদন্ডে এই বিষয়টিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, এবং খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থে এই বিষয়টি নিয়ে কি বলা হয়েছে, তা তালাশ করতে পারেন। তবে আমি যেহেতু মুসলমান, সেহেতু আমি আমার ধর্মগ্রন্থ পবিএ কোরআনেরই রেফারেন্স দেব।

পবিত্র কোরআনে আসলে একজন শাসক অজনপ্রিয় হয়ে গেলে তাকে নিয়ে কি করতে হবে, সেই বিষয়ে কিছুই বলা নেই। তবে কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া যে কোন প্রকার হত্যাকান্ডকে পবিএ কোরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আমি **“অবয়বহীন দুর্নীতি”** পেপারেই বলেছি, যে সকল বিষয়ে পবিত্র কোরআনে সুনির্দিষ্ট কোন কথা বলা নেই, সেই সকল বিষয়ে সাহাবীগণ হজরত মুহাম্মদ (সঃ) কে নিয়মিত প্রশ্ন করতেন। তিনিও সময় সময় এই সকল বিষয়ে উত্তর দিতেন।

তার এই আলোচনা, দিকনির্দেশনা, এবং মতামত লিপিবদ্ধ আছে বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে। এর মধ্যে আবার ছয়টি হাদিস গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত। এই ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে এক সাথে বলা হয় **সহীহ সিত্তাহ** বা নির্ভরযোগ্য ছয়। এর মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপুর্ণ হাদিস সংকলন সহীহ মুসলিমে এই বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপুর্ণ হাদিস রয়েছে।

যেমন সহীহ মুসলিম হাদিস গ্রন্থের ভলিউম ২০, নং ৪৫৬৯ হাদিসটি নিম্নরূপঃ

উম্মে সালমা (রঃ) হতে বর্ণিত, হজরত মহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "নিকট ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন শাসক আসবে যাদের ভাল কাজ তোমরা পছন্দ করবে এবং খারাপ কাজ অপছন্দ করবে। যে তাদের খারাপ কাজ দেখবে (এবং তা তার দলবল নিয়ে বা কথা দিয়ে প্রতিহত করবে), তার কোন দোষ নেই; যে তাদের খারাপ কাজ ঘৃণা করবে, সেও নিরাপদ। কিন্তু যে তাদের খারাপ কাজ অনুমোদন করবে এবং তা নকল করবে, সে নৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাবে।"

সবাই তখন জিজ্ঞেস করল, "তাদের বিরুদ্ধে কি আমরা লড়াই করব না?"

তিনি বললেন, "না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের প্রার্থনা বজায় রাখে।"

আবার একই গ্রন্থের ৪৫৭৩ নং হাদিসে বলা আছে,

আয়ুফ বিন মালিক হতে বর্ণিত, হজরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই শাসকই সর্বাপেক্ষা উত্তম যে তোমাদেরকে ভালবাসে এবং তোমরাও তাকে ভালবাস, যে তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করে এবং তোমরাও তাদের উপর তার রহমত প্রার্থনা কর। এবং শাসকদের মধ্যে সেই সবচেয়ে খারাপ যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং যে তোমাদেরকে ঘৃণা করে, যাকে তোমরা অভিশাপ দাও এবং যে তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়।"

(যারা উপস্থিত ছিল তারা) জিজ্ঞেস করল, "তাদেরকে কি আমরা তরবারির সাহায্যে ক্ষমতা থেকে নামাবো না?"

তিনি বললেন, "না, যতক্ষন পর্যন্ত সে তোমাদের মাঝে প্রার্থনা প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। তোমরা যদি তাদের মাঝে কোন অপ্রিয় বিষয় পেয়ে থাক, তাহলে তোমরা তাদের পারিষদকে ঘৃণা করবে, কিন্তু তাদেরকে মান্য করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবে না।"

এই দুটি হাদিস থেকে দুটি বিষয় পরিস্কারঃ

১. যে কোন পরিস্থিতিতে শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়া বৈধ নয়[১]।

[১] অস্ত্র হাতে তুলে না নিয়েও একজন শাসকের খারাপ কাজের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন কিভাবে গড়ে তোলা সম্ভব, তা নিয়ে অনেকে সন্দিহান হতে পারেন। শাসকের তো আর্মি রয়েছে, পুলিশ রয়েছে। শাসক তো খালি হাতের আন্দোলনকারীদের পিটিয়ে শেষ করবে। কিন্তু অস্ত্র ছাড়াও শাসকদের বিরুদ্ধে যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা যায় এবং শাসকদেরকে মাথা নত করতে বাধ্য করা যায়, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ রেখে গেছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যিনি মহাত্মা গান্ধী নামে সর্বাধিক পরিচিত।

২. শাসকদের খারাপ কাজে সমর্থন না দেয়া এবং খারাপ কাজকে প্রতিহত করা উত্তম, তবে তাদের সাথে অস্ত্র হাতে লড়াই বাধিয়ে দেয়া নিষেধ যতক্ষণ না শাসকরা ধর্মদ্রোহী হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মদ্রোহী ছিলেন, কিংবা তিনি জনগণকে ভালবাসতেন না, এই অভিযোগ নিশ্চয়ই তার পরম শত্রুও করবে না। তাই তাকে তো হত্যা করা অনৈসলামিক। এই কাজ তো ইসলাম সমর্থন করে না, এটি পরিষ্কার।

যারা ১৯৭৫ সালে এই হত্যাকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন, তারা নিজেরেদেরকে ইসলামপন্থী হিসাবে প্রকাশ করতে উদ্যত ছিলেন। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে না জেনে, না বুঝে একটি অনৈতিক কাজকে ইসলাম পসন্দ বানিয়ে দেশের একটি বিরাট গোষ্ঠীর মনে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা গড়ে তোলার তো কোন মানে নেই।

মৃত্যুদন্ডের বিধান সম্পর্কে আইএফডি'র অবস্থান

বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের মৃত্যুদন্ডের রায় দেয়া হয়েছে, এটা অনেকেরই প্রত্যাশিত ছিল।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, এই রায় এতোদিন দেয়া হল না কেন?

এর উত্তরও সবাই জানেন।

দীর্ঘদিন ইনডেমনিটি এক্টের কারণে এই বিচার প্রক্রিয়াই শুরু করা যায়নি ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে, তখন এই কালো আইনটি বাতিল করে বিচার প্রক্রিয়া প্রথমবারের মত শুরু করে।

এই হত্যাকান্ডের আসামীরা খুব ভাল করেই জানতেন এই হত্যাকান্ডের বিচার যদি শুরু হয়, তাহলে আদালতে তাদের মৃত্যুদন্ড হবে। তাই তারা যখন দেখলেন, তাদের এই কাজটি জনগণ এবং সেনাবাহিনী মেনে নিয়েছে, তখন খোন্দকার মোশতাক আহমদকে দিয়ে তারা তাদের বিচার প্রক্রিয়া রুদ্ধ করেন। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানও তাদের এই কাজে সমর্থন দেন এই কালো আইনটি পার্লামেন্টে পাশ করে। কারণ অন্যান্য অনেকের মত তিনিও খুব সম্ভবত বিশ্বাস করতেন, এই হত্যাকান্ডটি নৈতিক এবং বৈধ।

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ যখন ক্ষমতায় আসীন হন, তখনো তিনি এই কালো আইনটি বাতিলে কোন আগ্রহ দেখাননি। কারণ তিনিও ভাল করেই জানতেন, এই বিচার হলে কর্ণেল ফারুক-রশিদের মৃত্যুদন্ড হবে। তিনি যেহেতু সেনাবাহিনীরই একজন ছিলেন, সেহেতু অন্যান্য অনেক অফিসারের মত তিনিও এই বিষয়টিকে খুব সম্ভবত নৈতিক ভাবতেন।

তাই কর্ণেল ফারুক-রশিদরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর সবসময়ই ক্ষমতাধরদের আনুকুল্য পেয়ে এসেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসাতে। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ এই বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু পরবতীতে বিএনপি ক্ষমতায় আসাতে বিচার প্রক্রিয়া আবারো ঝুলে যায়।

২০০৯ সালে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না আসত, তাহলে আমরা এই বিচার আর চোখে দেখতাম না। কারণ বিএনপি ক্ষমতায় এলে কর্ণেল ফারুক-রশিদরা যে বিচার প্রক্রিয়াকে আবারো রুদ্ধ করে দিতেন, এটা নিশ্চয়ই দেশের শিশুও বোঝে। এই বিচার রুদ্ধ করার একটাই কারণ। এই বিচার সুষ্ঠুভাবে হলে তার রায় যে মৃত্যুদন্ডই হবে, সেটা সকলেই জানতেন।

বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সুশাসনের ঘাটতি থাকাতে ক্ষমতাধররা সবসময়ই হত্যাকান্ড ঘটিয়ে পার পেয়ে গেছেন। এটা অতীতে হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে। এখানে বলা দরকার মানব সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে হত্যাকান্ড ঘটেছে। মানুষ মানুষকে হত্যা করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। হিংসার বশে, ক্রোধের বশে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে। এই প্রবণতা কখনোই রোধ করা যাবে না। যে সকল দেশে বিচার ব্যবস্থা খুব উন্নত, সেই সকল দেশেও হত্যাকান্ড প্রতিনিয়তই ঘটছে। এই ধারাকে শূন্যে নামিয়ে আনা তাত্বিকভাবে সম্ভব হলেও বাস্তবে কখনো সম্ভব নয়।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলির ভিতরে এই ধরণের অবিচার কতটুকু হয়, তা আমার জানা নেই। তবে আন্তর্জাতিক পরিসরে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের মাধ্যমে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েও তাদের মুল হোতাদের কোন প্রকারের বিচারের আওতায় এখনো আনা যায়নি, এই ধরণের দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে।

তাই হত্যার বদলা একমাএ মৃত্যুদন্ডের মাধ্যমেই নিতে হবে - এই আইনকে যদি পরিবর্তন না করা হয়, তাহলে বাংলাদেশের মত সুশাসনহীন দেশে ক্ষমতাধররা হত্যা করে পুরো বিচার প্রক্রিয়াই স্তব্ধ করে রেখে দিবেন। তাই যিনি অত্যাচারিত, তিনি দ্বারে দ্বারে বিচারের জন্য ঘুরে বেড়াবেন। অথচ কোন প্রকার বিচার তিনি পাবেন না। এর কারণ যিনি হত্যাকারী, তিনি এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচতে চান। তিনি জানেন এই হত্যাকান্ডের বিচার হলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। তাই তিনি সর্বশক্তি দিয়ে এই বিচার প্রক্রিয়া রুদ্ধ করার চেষ্টা করবেন শুধুমাএ এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য।

অনেকে আমাকে বলবেন, আমাদের দেশে যখন চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, দুর্নীতি ইত্যাদির বিচার হচ্ছে না, তখন হত্যার আইন পরিবর্তন করার তো কোন মানে নেই। এই আইন থাকলেও যা, না থাকলেও তা।

হ্যা। এই কথা ঠিক।

কিন্তু এরপরও আমি বলব, হত্যার একমাএ শাস্তি মৃত্যুদন্ড – এই আইনের মধ্যে আমরা যদি পরিবর্তন আনতে পারি, তাহলে সমাজের সবচেয়ে বড় অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া পুরোপুরি রুদ্ধ না হওয়ার সম্ভাবনাটিকে আমরা কিছুটা হলেও বাড়াতে পারি।

আজকে আমরা না হয় কর্ণেল ফারুক-রশিদকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ন্যায়বিচার পেলাম।

কিন্তু প্রতিদিনই সমাজে যে কত ফারুক-রশিদ পার পেয়ে যাচ্ছে, তার খবর কি আমরা রাখছি?

প্রতিদিনই যে কত শেখ হাসিনা-শেখ রেহানা দ্বারে দ্বারে তাদের নিকটজনের হত্যার বিচার চেয়ে বেড়াচ্ছেন, তার খবর কি আমরা জানি?

আমাদের এই প্রশ্ন পাঠকদের কাছেই।

শেষ কথা

যে কোন যুদ্ধে জয়ী হওয়াটাই বড় কথা নয়। সেই যুদ্ধের জয়কে কে কতদিন কিভাবে ধরে রাখতে পারলেন, ইতিহাস সেটাই বড় করে দেখে।

যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর সেই যুদ্ধ জয়কে ধরে রাখার একটা সুন্দর ফর্মুলা রয়েছে। এই ফর্মুলা ব্যবহার করেছিলেন হজরত মুহাম্মদ (সঃ) আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে।

তিনি তার জীবনের দীর্ঘ সময় সংগ্রাম করে মক্কাবাসীদের উপর যখন জয়ী হয়েছিলেন, তখন তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। মক্কাবাসীরা তখন আতঙ্কে প্রহর গুনছিল কখন তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হবে। কারণ তারা অতীতে অনেক মুসলমানকে হত্যা করেছিল। তাদের উপর অত্যাচার করেছিল।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তার এই মহানুভবতা দেখে তৎকালীন কোরায়শ নেতারা তাকে এক বাক্যে নেতা মেনে নেয়। এই সকল কোরায়শদের অনেকেই ছিলেন জ্ঞানী, দক্ষ। তাই তাদের দক্ষতা এবং জ্ঞানকে মহানবী (সঃ) দেশ গঠনে পরবর্তীতে কাজে লাগিয়েছিলেন। ফলে গড়ে উঠেছিল এক সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য।

পরাজিতদের ক্ষমা করে দেয়া কিংবা তাদেরকে সহানুভূতির চোখে দেখা দীর্ঘদিন থেকে একটি মানবতার নিদর্শন হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই কারণেই জাতিসংঘে পাশ করা হয়েছে জেনিভা কনভেনশন যেখানে বলা হয়েছে যুদ্ধে পরাজিতদের সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে।

খুব সম্ভবত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও এই ফর্মুলার সাথে পরিচিত ছিলেন। তাই ১৯৭১ এ যুদ্ধ জয়ের পর তিনি পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন এবং লক্ষাধিক হত্যাকান্ড ঘটানোর পরও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

একই প্রবণতা দেখিয়েছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানও।

একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্বেও তিনি জাতীয় ঐক্য গঠনের লক্ষ্যে স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতি উন্মুক্ত করেছিলেন এবং তাদের অনেককে তিনি মন্ত্রী পরিষদে এবং দলে স্থান দিয়েছিলেন।

আজ পর্যন্ত আমাদের দুই জাতীয় নেতাই যে তাদের জয় ধরে রেখেছেন, এই বিষয়ে কারোরই কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

আজ বঙ্গবন্ধু জাতির জনক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি সবার মাঝে না থাকলেও আওয়ামী রাজনীতি তার নাম উচ্চারণ ছাড়া সম্ভব নয়।

একই কথা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বেলাতেও প্রযোজ্য।

বিএনপি তুলনামূলকভাবে একটি নতুন রাজনৈতিক দল হওয়া সত্বেও ১৯৯০ সালের পর দুইবার ক্ষমতায় আসতে পেরেছে। এটি শুধু যে বেগম খালেদা জিয়ার নের্তৃত্বের গুণের কারণেই হয়েছে, তা নয়। এর জন্য মানুষের মনে ব্যক্তি জিয়াউর রহমানের ইমেজও অনেকাংশে দায়ী। আজ বিএনপি'র কোন পোস্টারে জিয়াউর রহমানের ছবি না থাকলে সেই পোস্টারের কোন অর্থ থাকে না।

বর্তমান মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার বোন মিসেস শেখ রেহানাও অনেক যুদ্ধে জয়ী। তারা তাদের পরিবারের হত্যার বিচার চেয়ে চেয়ে বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছেন। তারপরও তারা ধৈর্য হারাননি। তারা একটি বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছেন এবং দেরিতে হলেও তারা তাদের বিচার পেয়েছেন।

পরিবারের সকল সদস্য নিহত হলে সেই অনুভূতি কেমন হয়, সেই সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। কারণ আমার বাবা-মা, ভাইয়েরা সকলেই জীবিত।

তাই আরো হাজারো শেখ হাসিনা-শেখ রেহানা ন্যায়বিচার ছাড়া কিভাবে দিনযাপন করছেন, সেই অনুভূতিও আমার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এই দুঃখ বুঝবেন একমাএ মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার বোন মিসেস শেখ রেহানা।

তাদের মত আরো হাজারো শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানাও যাতে হত্যার বিচার পান, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের আজকের এই স্পেশাল আর্টিকেল।

আইএফডি পরিচিতি

Ideas for Development (IFD) একটি ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক (Virtual Think Tank)। এর মূল ধারণার প্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালের জানুয়ারী ১৮ তারিখে একটি ইমেইলের মাধ্যমে। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির কোন অফিস নেই। এর ওয়েব এবং ইমেইল এড্রেসই এর ঠিকানা। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির উদ্যোক্তা সৌদি আরব প্রবাসী মি. ম. মাহমুদ। তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক। আইএফডি তারই চিন্তার ফসল।

এই ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংকটির মূল উদ্দেশ্য ইন্টারনেটের শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আইডিয়ার আদান প্রদানের মাধ্যমে দেশ, জাতি এবং সর্বোপরী মানবতার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। এটাই এই থিঙ্ক ট্যাংকটির মিশন স্টেটমেন্ট।

এই মিশন স্টেটমেন্ট প্রতিফলিত হয়েছে এই থিঙ্ক ট্যাংকটির লোগোতেও। এর লোগোতে চার রঙের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। এই চারটি রঙের মাধ্যমে বিশ্বের চারটি জাতি বা রেসকে (Race) বোঝানো হয়েছে। আইএফডি বিশ্বাস করে বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং অশান্তি রয়েছে, তার মূলে রয়েছে জাতিগত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য। তাই আমরা বিশ্বাস করি এই নানাবিধ বৈষম্য যদি দুর করা যায়, তাহলে বিশ্বে অস্থিরতা অনেক কমে আসবে।

কিন্তু বৈষম্য কমানোর জন্য চাই নতুন নতুন উন্নয়ন আইডিয়া। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর জাতিগুলি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন উন্নয়ন আইডিয়া তৈরি করছে এবং তার সফল বাস্তবায়ন করে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলি সম্পদ কম থাকার কারণে বা সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের কারণে এই প্রতিযোগিতায় দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র্য এবং শোষণ।

বিভিন্ন আইডিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতিগত এই ব্যবধান কমানোর একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আইএফডির সৃষ্টি। আইএফডি বিশ্বের সকল চিন্তাশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষদের আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হতে চায়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষরা তাদের আইডিয়ার আদান প্রদান করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আইএফডির মাধ্যমে আইডিয়া আদান প্রদান করলে একজন উদ্ভাবক বেশ কয়েকটি সুবিধা পাবেন।

প্রথমত, উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আইডিয়া তৈরি করাই শেষ কাজ নয়, বরং এটি পুরো প্রক্রিয়াটির শুরু মাত্র। একজন উদ্ভাবককে শুধু আইডিয়া তৈরি করলেই চলবে না, বরং একটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষনের মাধমে তার নতুন আইডিয়াটি দিয়ে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যাবে তা উপস্থাপন করতে হবে একটি মডেলের আকারে। সেই মডেল আবার বাস্তবায়নযোগ্যও হতে হবে। এর অন্যথা হলে সেই আইডিয়াটির আসলে কোন মূল্য নেই।

আমাদের চারপাশে নতুন আইডিয়া দেয়ার লোকের আসলে কোন অভাব নেই। তবে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এবং সর্বোপরী বাস্তবায়নযোগ্য আইডিয়া প্রণেতার সঙ্কট সর্বত্রই।

এই সঙ্কট সমাধানকল্পে আইএফডি একজন উদ্ভাবককে তার আইডিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পথ বাতলে দেবে। এক্ষেত্রে আইএফডি সম্ভব সবরকম গাইডেন্স প্রদান করবে এবং একটি সম্ভাবনাময় অথচ অপরিপক্ক আইডিয়াকে পরিপূর্ণ করতে সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠানোর জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে যে কোন মাধ্যমে আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্তমানে আইএফডি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক বিষয়ও ধীরে ধীরে এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চতুর্থত, আইএফডির মাধ্যমে কোন আইডিয়া প্রচার করা হলে সেই আইডিয়াটি যে একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত থাকবেন। ফলে আইডিয়াটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এখানে বলে রাখা দরকার, আইএফডি যে কোন আইডিয়া পেলেই তা প্রচার করবে না। বরং একটি আইডিয়ার মাধ্যমে সমাজ কতটুকু উপকৃত হতে পারে, সেটাই হবে আইডিয়া নির্বাচন করার মুল ভিত্তি।

এবং পঞ্চমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে হলে উদ্ভাবককে কোন খরচ করতে হবে না, শুধুমাত্র পোস্ট কিংবা ইমেইলের খরচ ছাড়া। এই আইডিয়া যদি প্রচারযোগ্য হয়, তাহলেও উদ্ভাবককে কোন প্রকার ফি বা চার্জ দিতে হবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া দিলে তা চুরি হয়ে যেতে পারে। ফলে একজন আইডিয়ার উদ্ভাবক বঞ্চিত হবেন তার যথাযথ স্বীকৃতি থেকে।

এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইএফডির কাছে কেউ কোন আইডিয়া পাঠালে তা উদ্ভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কোন নামে ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মতে, শুধুমাত্র একজন আইডিয়ার কারিগরের পক্ষেই সম্ভব অন্য আরেকজন আইডিয়ার কারিগরকে যথার্থ মুল্যায়ন করা।

আইএফডি বিশ্বাস করে একটি আইডিয়ার প্রকৃত মুল্যায়ন হয় তখনই যখন তা আংশিক বা পুর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তা মানুষের কাজে লাগে। এ দিক থেকে আইএফডির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ অনেক উন্নয়নমূলক আইডিয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার সহ অন্যান্য অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই আইএফডি এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে আইএফডির মাধ্যমে কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া প্রচার হলেই তার সফল বাস্তবায়ন হবে। আইএফডি শুধু আইডিয়া তৈরি এবং প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই কাজ করবে। এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইএফডির নয়।

তবে আইএফডির কার্যক্রম শুধুমাত্র আইডিয়া তৈরি এবং তার প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আইডিয়া তৈরি এবং তার সফল বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষ, তেমনি প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব, বলিষ্ঠ সরকার কাঠামো, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরী একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে চিন্তাশীল মানুষের যেমন জন্ম হবে না, তেমনি অস্থিতিশীল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে চিন্তাশীল মানুষদের উন্নয়ন আইডিয়ার যথার্থ মুল্যায়ন এবং বাস্তবায়নও হবে না।

তাই উন্নয়ন আইডিয়া প্রচারের পাশাপাশি আইএফডি এমন একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করবে যার মাধ্যমে যেন সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের সংখ্যা বাড়ে, তাদের যথার্থ মুল্যায়ন হয় এবং তাদের আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হয়। এই লক্ষ্যে আইএফডি বিভিন্ন ইস্যুতে তার মতামত ব্যক্ত করবে এবং বিভিন্ন রচনা প্রচার করবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আপনি যদি আপনার কোন আইডিয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হোন, এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের কিছু কল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে আইডিয়াটি আমাদেরকে লিখে পাঠান। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ইমেইল করুন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট।

আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের আইডিয়া আদান প্রদানের মাধ্যমে সর্বএ নতুন নতুন চিন্তাশীল মানুষের বিকাশ ঘটবে। তাদের চিন্তালব্ধ আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হলে লাভবান হবেন সকলেই। তাই এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। আইএফডির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক আইডিয়া প্রচারের জন্য যে কোন প্রকার সহযোগিতাকে তাই আমরা স্বাগত জানাই।

©Ideas for Development

ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org

Keyword for Websearch: The Assasination of Bangabandhu, Death Penalty and Some Words; IFD Special Article, Sahih Muslim Hadith on Behaviour with Rulers, 15th August Tragedy, Bangabandhu Murder, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, Justice in Bangladesh